


Vol. 3 | No. 1 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# ধ্বনিগুণ (Sound attributes)

| | |
|---|---|
| Volume | 3 |
| Issue | 1 |
| Year | 1959 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মুহম্মদ আবদুল হাই |
| Published online | June 15, 1959 |
| DOI | 10.62328/sp.v3i1.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v3i1.1 |
| Pages | 1-24 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা
বর্ষা, ১৩৬৬
Check for updates

# ধ্বনিগুণ
## ( Sound attributes )

মুহম্মদ আবদুল হাই

ভাষার মূল ধ্বনিতে। তবু ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার করতে গেলে ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়না। প্রত্যেকটি পৃথক ধ্বনি বাক্যের মধ্যে এক প্রাণ হ'য়ে সামগ্রিকতা লাভ করে। গতানুগতিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও বিধেয় মূলক কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান ক্রিয়া ইত্যাদি কারক বিভক্তি সম্পন্ন ব্যাকরণের আইনকানুন যুক্ত বৃহৎ বাক্যই হোক কিংবা ব্যবহার জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী একাক্ষরিক শব্দবিশিষ্ট নেহাত একটি ছোট বাক্যই হোক বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনি মানুষের মুখ নিঃসৃত হ'তে গিয়ে জীবন্ত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে নানা ভাবে স্পন্দিত হয়। সেজন্যে বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনির দুটো রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটা ভাষার মূলধ্বনিগত তার স্বতন্ত্র রূপ আর একটা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে উত্থিত জীবন্ত মানুষের আবেগানুভূতির স্পর্শ পাওয়া তার সামগ্রিক রূপ। এ দুই রূপে প্রত্যকটি ধ্বনি গুণান্বিত হয়।

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণের স্থান এবং উচ্চারণের প্রক্রিয়া উক্ত ধ্বনির স্বতন্ত্র রং ও রূপ ( tamber )কে অন্যান্য ধ্বনি থেকে বিশিষ্ট ক'রে তোলে। এ যাবৎ ধ্বনির সেই বিচ্ছিন্ন রূপেরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে আমরা দেখেছি উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ অন্য একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ থেকে পৃথক হ'য়ে গেছে। আবার এক স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছের প্রত্যেকটিই উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে

প্রত্যেকটি থেকে আলাদা হ'য়ে গেছে। এজন্যে উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে যেমন দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির ওষ্ঠতাকে তাদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক গুণ ব'লে আমরা মেনে নিয়েছি, ধ্বনির দন্ত্যত্ব, দন্ত মূলীয়ত্ব, দন্ত্যওষ্ঠত্ব, দন্তমূলীয়তালব্যত্ব, এবং পশ্চাৎ তালব্যত্ব প্রভৃতি স্থানবাচক বৈশিষ্ট্য তেমনি ধ্বনির স্থানবাচকতা গুণ নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। স্থানবাচকতা ধ্বনির পৃথকীকরণ জনিত গুণ নির্ণয়ে সহায়ক হলেও তা ধ্বনিগুণের স্থূলতর দিক উদ্‌ঘাটিত করে। এর তুলনায় উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত গুণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। তার কারণ এক স্থান জাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রত্যেকটি থেকে পৃথক হ'য়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক, চ, ট, ত এবং প বর্গীয় যে কোন এক বর্ণের একটি ধ্বনি যে উক্তবর্গের আর একটি থেকে আলাদা হয় তা তার ঘোষতা কিংবা অঘোষতার বৈপরীত্যে, মহাপ্রাণতা কিংবা স্বল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্যে। অঘোষতা, ঘোষতা, স্বল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা 'ক', 'গ' 'খ', 'ঘ' প্রভৃতি ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিয়ামক হিসেবে পৃথক ভাবে যেমন এদের প্রত্যেকটির গুণ নির্ণায়ক, তেমনি স্পর্শতা ( plosivity ), উষ্মতা ( friction ), স্পৃষ্টঘৃষ্টতা ( affrication ) পার্শ্বত্ব ( laterality ), অনুনাসিকত্ব ( nasality ), তাড়নত্ব ( flapness ), কাঁপুনি ( rolling ), প্রভৃতি গুণ প্রত্যেকটি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক। এ সব ধ্বনিগুণের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে কিংবা গোটাদুয়েক মিলিতভাবে ধ্বনির নিম্নপর্যায়ে অর্থাৎ বাক্যঅসংলগ্ন ভাষার মূলধ্বনিকে একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু এহ বাহ্য।

ধ্বনি বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে জীবন্ত মানুষের ব্যবহারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের তাড়নায় রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা, প্রভৃতি অনুভূতির ধারণক্ষম আধার হিসেবে কিংবা ক্ষুৎপিপাসাজনিত মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জৈব জীবনের বাহন হিসেবে ধ্বনিতে জীবন সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে। তখন প্রত্যেকটি ধ্বনিতে তার স্বতন্ত্র রূপের অতিরিক্ত অনির্বচনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কিসের সাহায্যে এ বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার স্বাদ আমরা পাই? বীণার তারে তারে ঝঙ্কার উঠ্‌লে নানা সুর ধ্বনিত হয় এবং সে সুর অনুরণিত হ'য়ে শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, মনকে মুগ্ধ করে। মানুষের

মুখনিঃসৃত কথার মধ্যে ধ্বনিতে ধ্বনিতে আঘাত সংঘাতে এমনি শত সুর ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। সে সুর বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি। তাতে পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের আভাস পরিস্ফুট হয়। তারই সাহায্যে ভাষার মধ্যে মানুষের কণ্ঠধ্বনির তথা জীবনের আভাস পাই। ভাষায় জীবন্ত মানুষের কণ্ঠধ্বনির এ ছাপ কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও স্থূল, কোথাও তীক্ষ্ণ, কোথাও প্রলম্বিত—কোথাও জোরালো, আর কোথাও বা নিস্পন্দ। নদীস্রোতে যেমন নানা তরঙ্গ ওঠে, মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনিতেও তেমনি সেই তরঙ্গেরই লীলা। তা-ই ভাষার ধ্বনিগুণের সূক্ষ্ম ও জটিলতম দিককে উদঘাটিত করে দেয়। ধ্বনির এ সূক্ষ্ম সুন্দর সামগ্রিক গুণ একদিকে যেমন অনুভূতি সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি বিশ্লেষণাতীত। এদিক থেকে সামগ্রিক ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে দৈর্ঘ্য (length), ঝোঁক ( stress ), শ্রুতিদ্যোতকতা ( Prominence ), জোর ( emphasis ), ধ্বনিতরঙ্গ ( intonation ) প্রভৃতি গুণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে দৈর্ঘ্যের কথা ধরা যাক। বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে শব্দার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন অক্ষর ( syllable ) কিংবা ধ্বনি দীর্ঘায়িত হ'তে পারে। কোনো কথা লিখতে গেলে যেমন একটা হরফের পর আর একটা হরফ আসে সেটাকে পড়তে গেলে প্রত্যেকটি হরফের অন্তর্নিহত ধ্বনি সময়স্রোতে উন্মুক্ত হ'তে গিয়ে এক সেকেণ্ডের শত ভাগের একভাগ হ'লেও কিছু না কিছু সময় নেয়। এদিক থেকে প্রত্যেকটি ধ্বনিরই ( তা স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি যাই হোক না কেন ) duration বা স্থিতিগত একটা দিক আছে। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির স্থিতিজনিত বা পরিমানগত দিক প্রায়

ধ্বনি (duration)

প্রত্যেক ভাষাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। মূলধ্বনি ( phoneme ) হিসেবে কোনো কোনো ভাষার স্বরের দীর্ঘতা তার হ্রস্বধ্বনির তুলনায় তার কালপরিমানকে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তোলে। প্রসঙ্গক্রমে মূলধ্বনি হিসেবে ইরেজীর 'feel', 'seed', 'seat' প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ 'i:' (ঈ) এবং 'fool', 'cool' প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ 'u:' (ঊ) র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজীতে আভিধানিক পর্যায়ে দীর্ঘ 'i:' এবং দীর্ঘ 'u:' হ্রস্ব 'i' এবং হ্রস্ব 'u' সমন্বিত শব্দকে অর্থের দিক থেকে পৃথক ক'রে দেয়। তুলনীয় 'feel' এবং 'fill', 'fool' এবং 'full' শব্দাবলী।

বাংলা হরফে হ্রস্ব ই এবং ঈ, হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ আমরা লিখলেও মূলধ্বনি হিসেবে 'ঈ' এবং 'ঊ' এর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ ইংরেজীর মতো বাংলার হ্রস্ব 'ই' এবং 'ঈ' কিংবা হ্রস্ব 'উ' এবং ঊ দিয়ে অন্যান্য ধ্বনি ঠিক রেখে দুটো স্বতন্ত্র শব্দ আমরা পাইনা। বাংলার স্বরধ্বনিতে মূল স্বরধ্বনি হিসেবে হ্রস্ব কিবা দীর্ঘ 'ই' এবং হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ 'ঊ' এর কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। প্রশ্ন ওঠে শুধু 'ই' জাতীয় একটি ধ্বনির এবং 'উ' জাতীয় আর একটি ধ্বনির। বাংলায় মূলধ্বনি হিসেবে 'ই' এবং 'উ' এর দীর্ঘত্ব কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিগুণের সৃষ্টি করে না। তা না করলেও বাংলার 'এ', 'এ্যা,' 'আ', 'অ', 'ও' এবং 'ও' র মতো 'ই' এবং 'উ' এরও পরিমানগত একটা অবস্থিতি আছে। তা-ই তার স্বাতন্ত্র্যগত বৈশিষ্ট্য, তার স্বরূপ, তার 'tamber'। বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে প্রয়োজনানুসারে এদের প্রত্যেকটিই নানা মাপজোখের দীর্ঘত্বই গ্রহণ করতে পারে। বাংলা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে শেষের সিলেবলের যে কোন স্বরধ্বনির উচ্চারণই সময়ের দিক থেকে দীর্ঘতম আর তার পূর্ববর্তী সিলেবলের স্বরধ্বনিগুলোর দৈর্ঘ্য আপেক্ষিক ভাবে হ্রস্বতা লাভ করে—ফলে শব্দের প্রথম সিলেবলের স্বরধ্বনিই হয় হ্রস্বতম, এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বরধ্বনির এ দীর্ঘত্ব মূলধ্বনিগত নয়। ইংরেজীতে মূলধ্বনি হ্রস্ব 'i' এবং দীর্ঘ 'i:' এর মধ্যে এবং মূলধ্বনি হ্রস্ব 'u' এবং দীর্ঘ 'u:' এর মধ্যে সময় ঘটিত দীর্ঘত্বের যে তফাৎ এখানকার হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের মধ্যে সে তফাৎ নয়। বাংলা বাক্যে হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ বাহন হিসেবে প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই তার মূলধ্বনিগত ( Phonemic ) স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অগণিত মাপজোখের ( infinite shades of length ) দীর্ঘত্বের পরিচয় বহন করতে পারে।

স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য

স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অ-স্পৃষ্ট ( non Plosive ) ব্যঞ্জনধ্বনির এবং স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব নানা মাপে ছোট বড় করা যায় কিন্তু অস্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির যে দীর্ঘত্ব তা অনায়াসলভ্য ব'লে স্বরধ্বনির বহুভঙ্গিম লীলায়িত রূপেই আমরা বেশী ক'রে মুগ্ধ হই ; আর ভাবাবেগের টানাপোড়েনে স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর কিংবা হ্রস্ব হ'তে হ্রস্বতর ক'রে বাগধ্বনির

লীলারস আস্বাদন করি। বাংলাভাষার শব্দ ও সিলেবল গঠনে স্বরধ্বনিই প্রধানভাবে সহায়তা করে— অন্য কথায় স্বরধ্বনিই বাংলা সিলেবল তথা অক্ষরের নিয়ামক ( nucleus ) ব'লে প্রয়োজনানুযায়ী উক্ত স্বরধ্বনিকে টেনে ছোট বড়ো করা যায়। সে জন্যে কি স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা বক্তৃতায়, কি কোন গদ্যাংশের পাঠে কিংবা কবিতার আবৃত্তিতে শব্দান্তর্গত অক্ষরের মাত্রার নির্ভরস্থল স্বরধ্বনিতে হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘত্বের লীলা আস্বাদন-যোগ্য। এভাবে স্বরধ্বনি সময়ের পরিমাণ ( duration )গত দিক থেকে মাত্রার নিয়ামক হয় ব'লে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি।

উদাহরণ স্বরূপ দূরত্ববাচক 'ওই' সর্বনামটির বিশ্লেষণ করা যাক। এটি মূলত দ্বিস্বর ( dipthong ) ধ্বনি। এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে প্রথম স্বরধ্বনি 'ও' স্বতন্ত্র কোন 'ও' ধ্বনির তুলনায় সামান্য একটু দীর্ঘ হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু এ শব্দটির সাহায্যে সাধারণ দূরত্ব বোঝাতে গেলে এ দ্বিস্বরধ্বনির প্রথমাংশ 'ও' কে একটু টেনে 'ও-ই' ভাবে ছেড়ে দিলেই চলে। কিন্তু দূরত্বের ব্যবধান যতই বেশী হ'তে যাবে ততই দেখা যাবে 'ও' র দীর্ঘত্বের মাত্রাও ক্রমেই 'ও—ই', 'ও— - -ই', 'ও - - - - ই' ভাবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে উঠেছে। কোন রূপকথায় এ পরিবেশ ( context of situation ) ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে দেখা যাবে 'ওই' শব্দের 'ও' ধ্বনি উচ্চারিত হ'তে না হ'তে 'ও - - - - ই' রূপে এমনভাবে দীর্ঘায়িত হ'য়ে উঠেছে যে শেষ পর্যন্ত 'ও' র পর একটানা একটা লম্বমান সুরের রেশ ছাড়া কানে যেন আর কিছুই ভেসে আসতে চায়না। এমনিভাবে সমাজজীবনের অবস্থাবৈচিত্র্যে ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য শেষ পর্য্যন্ত সুরের সূক্ষ্ম পাড়ে পরিণত হ'য়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে 'আ' স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের তারতম্যের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পরিবেশটা এরকম ক্ষেত্রে সোহাগের, স্নেহের, আদর আবদার কিংবা প্রেমের হ'তে হবে। বক্তা ( speaker ) এবং শ্রোতা ( hearer ) সমাজ জীবনের এমন একটা সুন্দর মুহূর্তের রূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে এমন এক মধুর মাহেন্দ্রক্ষণের অবতারণা করেছে যার নিবিড়তম স্বাদ শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারবে; বাইরে থেকে অন্য কারুর পক্ষে তার মাধুর্যের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হবেনা।

এরকম ক্ষেত্রে সমাজ সম্পর্কের ( social context ) নিতান্ত মামুলি কথাতেও যে কত রস কত স্বাদ এবং কত আনন্দ আছে তার উপভোগের অধিকার এক্ষেত্রে শুধু বক্তা ও শ্রোতারই। ধরা যাক বক্তা এক্ষেত্রে স্ত্রী আর শ্রোতা স্বামী। স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে সাংসারিক সম্পর্কের দাবীতে নয় বরং হৃদয় সম্পর্কের দাবীতে সাংসারিক প্রয়াজনের অতিরিক্ত একটা পাওনা আদায় করতে গিয়ে কিছু টাকাই চেয়ে বসলেনে। বললেন, 'দাওনা—দাও' তারপর শুরু হলো আদর ও আবদারের পালা— 'দা-ও', 'দা—ওনা'—, 'দা-া-া- -ও', 'লক্ষ্মী, দা - - - ও !' এক্ষেত্রের 'দ' ধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ' হৃদয়াবেগের এবং স্নেহ সোহাগের আধার হিসেবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর আর সেজন্য মধুর থেকে মধুরতর হ'য়ে উঠ্‌বে নাকি ? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যকে শুধু হ্রস্বের তুলনায় দীর্ঘ 'আ' কিংবা 'প্লুত আ' বলেই কি মুক্তি পাওয়া যাবে ? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের পরিমাপে কি আর এর দীর্ঘত্ব ধরা যাবে ? এ থেকে কি প্রতিপন্ন হয়না যে ভাষা মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে সিক্ত ও সমৃদ্ধ হ'য়ে জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লে তাতে জীবনের রূপ যে কত ভাবে তরঙ্গায়িত হয় তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ধ্বনিতে জীবনের এ রস সংক্রমণে ধ্বনির যে দৈর্ঘ্য পরিস্ফুট হয় তা তার সামগ্রিক রূপের আর তা-ই ধ্বনির ব্যখ্যাতীত সামগ্রিক গুণেরও।

স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যতটা সহজবোধ্য এবং সুস্পষ্ট ভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ততটা নয়। তাই অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য সাধারণ্যে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আন্তঃস্বরীয় ( intervocalic ) অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বল্পতম, শব্দের গোড়াতে তার তুলনায় দীর্ঘতর কিন্তু শব্দের শেষে আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম। উদাহরণ স্বরূপ 'থাকুক্' ( thākuk ) এ শব্দটির প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি 'থ', আন্তঃস্বরীয় 'ক' এবং শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জন 'ক্'এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করলে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপাত অমুক্ত ব'লে উচ্চারকেরা তদবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে আঁটকে থাকে দেখে এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য অনুভব করা যায়। আবার শব্দমধ্যবর্তী অভিনিধান প্রাপ্ত অমুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর। তুলনীয় 'উপ্‌টান্',

অসংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির দৈর্ঘ্য

'রাগ্‌ঝাল', 'তচ্‌নচ্‌', 'সাত্‌পাঁচ্‌', 'শাব্‌ভাত্‌', প্রভৃতি শব্দ। এ শব্দগুলোর অভিনিধান প্রাপ্ত 'প্‌', 'গ্‌', 'চ্‌', 'ত্‌' 'ক্‌' ধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জধ্বনি 'ন্‌', 'ল্‌', 'চ্‌', 'ত্‌' আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘতর।

শব্দের শুরুতে 'স্ক', 'স্খ', 'ষ্ট', 'স্ত', 'স্থ', 'স্ন', 'স্প', 'স্ফ', 'স্প্‌', 'স্ত্র', 'ক্র'(ক্‌), 'খ্র'(খ্‌), 'গ্র'(গ্‌), 'ঘ্র'(ঘ্‌), 'জ্‌', 'ট্র', 'ড্র', 'ত্র'(ত্‌), 'থ্র', 'দ্র', 'ধ্র'(ধ্‌), 'প্র'(প্‌), 'ফ্র', 'ব্র'(ব্‌), 'ভ্র' (ভ্‌), 'ম্র'(ম্‌), 'শ্র'(শ্‌), 'ন্‌', 'ক্ল', 'গ্ল', 'প্ল', 'ফ্ল', 'ব্ল', 'ম্ল' এবং 'শ্ল'—নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এই একপ্রাণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো এ পর্যায়ের অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় দীর্ঘতর কিন্তু শব্দের মাঝখানে যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য যেমন সাধারণ কথাবার্তায় তেমনি ভাষার আলঙ্কারিক ব্যবহারেও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক (prominent) সেজন্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির এ দৈর্ঘ্য শব্দের শুরুতে তেমন নয় বরঞ্চ শব্দের মাঝখানেই বিশেষভাবে সুপরিস্ফুট।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য

বাংলার শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এ ধরণের তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'র' (্র) ও 'ল' ফলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি তথা তরলধ্বনি জাত এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো যেমন— -ক্র- (আক্রান্ত-আক্‌ক্রান্ত), -কৃ- (আকৃতি-আক্‌কৃতি), -গ্র- (আগ্রহ-আগ্‌গ্রহ), -গৃ- জাগৃতি (জাগ্‌গৃতি), -ঘ্র- (আঘ্রান-আগ্‌ঘ্রান), -ছ্র- (উচ্ছ্রয়), -ছৃ- (উচ্ছৃঙ্খল), -জ্র- (বজ্র-বজ্‌জ্র) -ত্র- (পুত্র-পুত্‌ত্র) তৃ- (পিতৃ-পিত্‌তৃ), -দ্র- (ভদ্র -ভদ্‌দ্র), -দৃ- (আদৃত-আদ্‌দৃত), -ধৃ- (বিধৃত-বিদ্‌ধৃত), -ন্ন- (অনৃত-অন্নৃত), -প্র- (আপ্রাণ-আপ্‌প্রাণ), -ব্র- (অব্রাহ্মণ-অব্‌ব্রাহ্মণ), -বৃ- (আবৃত্তি-আব্‌বৃত্তি), -ভৃ- (পরভৃত-পরভ্‌ভৃত), -ম্র- (আম্র-আম্‌ম্র), -মৃ- (অমৃত-অম্মৃত), -শ্র- (আশ্রয়-আশ্‌শ্রয়)। -ক্ল- (শুক্ল-শুক্‌ক্ল), -প্ল- (আপ্লুত-আপ্‌প্লুত), -ম্ল- (অম্লান-অম্মান); (২) দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) এ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যেমন -ক্ক- (পক্ক-পক্‌কো), -ক্খ- (সখ্য, সক্‌খো), -গ্‌গ- (ভাগ্য, ভাগ্‌গো), -চ্‌চ- (উচ্চারণ), -চ্‌ছ- (আচ্ছা) -জ্জ- (সজ্জা, শয্যা-শজ্‌জা), -জ্ঝ- (সহ্য, সজ্‌ঝো), -ট্‌ট- (অট্টালিকা) -ড্‌ড- (বড্‌ডো), -ড্‌ঢ- (বুড্‌ঢা), -ত্‌ত- (সত্য-সত্‌তো, উত্তরণ-উত্‌তরণ) -থ্‌থ- (পথ্য, পত্‌থো), -দ্দ- (মোদ্দা), -দ্‌ধ- (বুদ্ধি-বুদ্‌ধি), -প্প্‌- (গপ্‌প), -ব্‌ব-

(সব্‌বাই), -ব্‌ভ- (গব্‌ভো), -শ্‌শ- (আশ্বাস-আশ্‌শাস), -ল্‌ল- (বোল্‌লা), -ল্‌লহ- (আহলাদ-আল্‌লহাদ), -র্‌র- (ছর্‌রা), -র্‌রহ- (বর্হ-বর্‌রহ) -ন্ন- (পান্না), -ন্‌নহ- (বহ্নি-বননিহ), -ম্‌ম- (সম্মান), -ম্‌মহ (ব্রাহ্মণ-ব্রাম্‌মহণ) ; (৩) এবং শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত ( homorganic ) এ নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যেমন -ঙ্ক- (ঝঙ্কার), -ঙ্খ- (সংখ্যা), -ঙ্‌গ- (সঙ্গ), -ঙ্ঘ- (সঙ্ঘ), -ঞ্চ- (বঞ্চনা), -ঞ্ছ- (বাঞ্ছা), -ঞ্জ- (সঞ্জাত), -ঞ্ঝ- (ঝঞ্ঝা), -ণ্ট- (বণ্টন), -ণ্ঠ- (লণ্ঠন), -ণ্ড- (আণ্ডা), -ন্ত- (পান্ত), -ন্থ- (পান্থ), -ন্দ- (মন্দ), -ন্ধ- (সন্ধান), -ম্প- (ঝম্প), -ম্ফ- (গুম্ফ), -ম্ব- (গুম্বজ), -ম্ভ- (গম্ভীর),

উল্লিখিত 'র্', 'ল্', ও 'ল' ফলাজাত তরলধ্বনি নিঃসৃত এবং দ্বিত্বপ্রাপ্ত শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আঘ্রাণ = আগ্‌/ঘ্রাণ, শুক্ল = শুক্‌/ক্ল, সত্য = সত্‌/তো, আশ্বাস = আশ্‌/শ্বাস প্রভৃতি ) শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই অক্ষরে ( সিলেবলে ) বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে তার প্রথমভাগ পূর্ববর্তী অক্ষর এবং দ্বিতীয় ভাগ পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে উচ্চারিত হয় দেখে তার প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় ( organs of speech )গুলো কিছুক্ষণের জন্য অর্গলবদ্ধ হ'য়ে যায়। সে জন্য সময়ের দিক থেকে এ গুলোর উচ্চারণের কালপরিমাণই বিশেষভাবে দীর্ঘ, অন্তত তার দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ। এ কারণেই বোধ হয় আগের দিনে পুত্র, পত্র প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত পদ্ধতির বানানে এ ধরণের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব রক্ষা করা হতো। এ সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই অক্ষরে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় দেখে তার প্রথম ভাগ অর্গলবদ্ধ অমুক্ত উচ্চারণ পায় আর দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র্যভাবে দীর্ঘতা লাভ করে ; তার দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ হ'য়ে যায়। এ দৈর্ঘ্য যেমন কানেও ধরা পড়ে, kymograph tracingএও তেমনি তার পরিমাপ করা যায়।

শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুনাসিক ধ্বনিটি (তুলনীয় ঝঙ্কার = ঝঙ্‌/কার, ঝঞ্ঝনা = ঝন্‌/ঝনা, ঝম্প = ঝম্‌/পো প্রভৃতি শব্দ) র উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় গুলোর অনুরূপ অবস্থা হয় ব'লে এ পরিবেশে এগুলোর কালপরিমাণও রীতিমতো দীর্ঘ।

ওপরে আলোচ্য শব্দমধ্যবর্তী এ তিন শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কোন্ প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণের কালপরিমাণ দীর্ঘতম তার গাণিতিক হিসাব করা যায় এদের প্রত্যেকটির kymograph tracing নিলে। অনুভূতির সাহায্যে বিচার ক'রে বড্ডো, সত্তা গত্ত, মিথ্যা প্রভৃতি দ্বিত্ব প্রাপ্ত ( geminated ) ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির কালপরিমাণই আমার কাছে দীর্ঘতম ব'লে মনে হয়েছে।

ভাষা কথা হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লে তার অন্তর্নিহিত ধ্বনিগুণ ব্যাখ্যায় যে অসুবিধা, কাব্য সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-মাধুর্য্যের ব্যাখ্যা তার চেয়েও কঠিনতর। তবু মানুষের প্রায়াসের শেষ নেই। অধরাকে ধরবার জন্যে, অনির্বচনীয়কে বচনে বিন্যস্ত ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে সমালোচনার সৃষ্টি। কবিতার যে ছন্দ—আলোচনা তাও এ প্রয়াসজাত। বাংলা কবিতার মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির লীলা উপলব্ধির জন্যে মাত্রাবিন্যাসের আয়োজন করা হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বর, হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথম স্বরে দুই মাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুরূপ ক্ষেত্রে শব্দশেষে সর্বদা দুই মাত্রা, শব্দমধ্যে কিংবা শব্দের শুরুতে সচরাচর একমাত্রা ক্ষেত্রবিশেষে দু'মাত্রা এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই একমাত্রা, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হ'লে দু'মাত্রা ধরা হয়। মাত্রা ত ধ্বনির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সময়ের গোনাগুন্‌তির হিসেবে তার নিম্নতম unit বা একক। এসব ক্ষেত্রে এক মাত্রা না ধ'রে দু মাত্রাই বা ধরা হয় কেন আবার দুয়ের অধিক মাত্রাই বা ধরা হয় না কেন?

বাংলা কবিতার মাত্রার কালপরিমাণ

সংস্কৃতের ছন্দ Quantitative, কিন্তু বাংলার মতো এক দুই মাত্রায় তার শেষ নয়। প্রয়োজনানুসারে মাত্রার ভগ্নাংশেরও সেখানে স্বীকৃতি আছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় মাত্রার ভগ্নাংশ স্বীকার করা যে যায় না তা নয়। কবিতার চরণের প্রত্যেকটি সিলেবলই যে হিসাবমাফিক এক কিংবা দুই মাত্রার ছাঁদে মেপে পড়া হয় তাও নয়। হয়তো যেটি দু'মাত্রার অক্ষর সেটিকে অন্য একটি দু'মাত্রার অক্ষরের তুলনায় কিছু বেশী কিংবা কম সময়ে পড়া হয় কিন্তু হিসেবের দিক থেকে পুরো একমাত্রাকে ভেঙে তার ভগ্নাংশ স্বীকার করতে গেলেই অনাবশ্যক

জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেজন্যে পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে শ্রুতি বিচারে এক এবং দু'মাত্রার অক্ষরই বাংলা ছন্দের পূর্ণতার গতি নিয়ামক হ'য়ে রয়েছে।

বাংলা ছন্দের বিভিন্ন নামকরণ এবং বৈচিত্র্য সবটাই নির্ভর করছে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরের মাপের ওপর। তা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর হওয়ার জন্যেই হোক, কিংবা অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বরই হোক কিংবা দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষ স্বরধ্বনিটির ব্যঞ্জনান্তিক (consonantal) ব্যবহারের জন্যই হোক সর্বত্র এক নীতিই ক্রিয়া করে। এ ধরণের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরে টেনে পড়ার অবকাশ থাকে ব'লে তার পড়ার ওপর নির্ভর করে ছন্দ বৈচিত্র্য সাধিত হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম ক্ষেত্রে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিজনিত বদ্ধাক্ষর তথা closed syllableকে মুক্ত বা open syllableএর তুলনায় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়া হয় বলেই বদ্ধাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে দু'মাত্রা ধরা হয় আর মুক্তাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে একমাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্তে পড়ার ভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে এসব ক্ষেত্রে কোথাও একমাত্রা ধরা হয় কিন্তু ছড়ার ছন্দ স্বরবৃত্তে এক মাত্রা ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে মাত্রার যে হিসাব তা সর্বত্রই স্বরধ্বনি কেন্দ্রিক। এ হিসাবে ব্যঞ্জনধ্বনিকে তেমন আমল দেওয়া হয়না। তার মানে কি এই যে কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো duration নেই? মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিতে কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনি কি কোনো কাজেই আসে না?

বাংলায় স্বরধ্বনি syllable তথা অক্ষর গঠন করে দেখে open syllable বা মুক্তাক্ষরে ( তুলনীয় আ, ও, খা, যা, বা, কি, কে, রো প্রভৃতি ) স্বরধ্বনিই যেমন time marker বা মাত্রার ধারক হয় তেমনি closed syllable বা বদ্ধাক্ষরে [তুলনীয় কাজ্, কাম্, জয়্, বুদ্‌ধি (বুদ্ধি), পত্‌ত্র (পত্র), ছায়্, ওই্ প্রভৃতি] শেষের ধ্বনি ব্যঞ্জনান্তিক হওয়ার জন্যে তার পূর্ব স্বরই মাত্রাবাহক বা time marker রূপে পরিগণিত হয়। সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির duration থাকা সত্ত্বেও মুক্তাক্ষরে ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং বদ্ধাক্ষরে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির duration ছোট বড়ো হয়ে কানে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। একারণেই মনে হয় ধ্বনির duration বা অবস্থিতি সবটাই যেন স্বরধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির যেন কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক বিচারে কিন্তু এর সবটুকু সত্য নয়। ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি স-ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। সুতরাং সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জন-

ধ্বনিরও যে duration আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ব্যঞ্জনধ্বনির duration ঘটিত length স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা কবিতার ভাষায় বিশেষভাবে কানে ধরা পড়ে শব্দমধ্যবর্তী এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটির প্রথমভাগে— -'ক্র'-, -'(কৃ)'-, -'গ্র'-, -'(গৃ)'-, -'থ্র'-, -'ছ্র'-, -'ছ্‌'-, -'জ্র'-, -'ত্র'-, -'(তৃ)'-, -'দ্র'-, -'(দৃ)'-, -'ধ্‌'-, -'নৃ'-, -'প্র'-, -'ব্র'-, -'(বৃ)'-, -'ভৃ'-, -'ম্র'-, -'(মৃ)', -'শ্র'-, -'ক্ল'-, -'প্ল'-, -'ম্ল' ;-

কবিতায় সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রথম-টির দৈর্ঘ্য

দ্বিত্বপ্রাপ্ত এ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে— -'ক্ক'-, -'ক্‌খ'-, -'গ্‌গ'-, -'চ্চ্‌'-, -'চ্ছ্‌'-, -'জ্জ্‌'-, -'ঝ্ঝ'-, -'ট্ট'-, -'ড্ড'-, -'ড্‌ঢ'-, -'ত্‌ত'-, -'ত্‌থ'-, -'দ্দ'-, 'দ্‌ধ'-, -'প্‌প'-, -'ব্‌ব'-, -'ব্‌ভ'-, -'শ্‌শ':, -'ল্‌ল্‌', -'ল্‌লহ'-, -'র্‌র'-, -'র্‌রহ'-, -'ন্ন'-, -'ন্‌নহ'-, -'ম্ম'-, -'ম্‌মহ'- এবং সমস্থানজাত এ নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলোর প্রথম নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে যেমন— -'ঙ্ক'-, -'ঙ্খ'-, -'ঙ্গ'-, -'ঙ্ঘ'-, -'ঞ্চ'-, -'ঞ্ছ'-, -'ঞ্জ'-, -'ঞ্ঝ'-, -'ণ্ট'-, -'ণ্ঠ'-, -'ণ্ড'-, -'ণ্ঢ'-, -'ন্ত'-, -'ন্থ'-, -'ন্দ'-, -'ন্ধ'-, -'ম্প'-, -'ম্ফ'-, -'ম্ব'-, -'ম্ভ'- এবং শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থিত অভিনিধানপ্রাপ্ত অমুক্ত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটিতে। যেমন— -কৃত- (ভক্ত), -দ্‌গ- (উদ্‌গার), -প্‌ত- (তপ্ত), -কৃদ- (বাকদত্ত) জাতীয় ধ্বনি সমন্বিত শব্দে।

এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে দৈর্ঘ্য যে এদের উচ্চারণ প্রতিক্রিয়া-জাত তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কবিতা আবৃত্তির সময়ে প্রতিটি ধ্বনি সাধারণ কথার তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ব্যঞ্জিত হয় আর সংযুক্তব্যঞ্জনধ্বনি-গুলোর প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় রুদ্ধাবস্থায় থেকে তাদের উচ্চারণকে সুস্পষ্টতর করে তোলে দেখে কবিতায় এসব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কালপরিমাণজনিত দৈর্ঘ্য স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম স্পর্শধ্বনিটির দৈর্ঘ্য তার পরবর্তী ধ্বনিটির তুলনায় যে দ্বিগুণ তা যেমন অনুভূতি সাপেক্ষ তেমনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষিত। কিন্তু দ্বিত্বপ্রাপ্ত অ-স্পৃষ্ট (যেমন শ, স, র, ল, ন, ম, ঙ প্রভৃতি) ধ্বনির উচ্চারকদের সন্নিহিত অবস্থায় বাতাস বের হয়ে গেলেও তাদের উচ্চারকরা তদ্‌গত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে দেখে তাদের প্রথমটির দৈর্ঘ্যও পরবর্তীটির তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।

শব্দমধ্যবর্তী এ ধরণের হলন্ত বঞ্জ্যনধ্বনি যেমন তার পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে দীর্ঘ—অনেকক্ষেত্রেই যেমন দ্বিগুণ—তেমনি শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিও শব্দের অন্যত্র অবস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ। বাক্, থাকুক্, মাপ্, শরম্, নানান্ প্রভৃতি শব্দের শেষ হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ অনুভব করার প্রয়াস পেলেই একথার যাথর্থ উপলব্ধি করা যাবে।

সাধারণ কথাবার্তায় বাংলা ধ্বনির এ সবক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যজনিত আনুপাতিক যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে কিংবা গদ্যের পঠন পাঠনেও বলাবাহুল্য তা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

(আমি) বসুধা বক্ষে | আগ্নেয়াদ্রি | বাড়ব্-বহ্নি | কালানল্ ০ ০
(আমি) পাতালে মাতাল্। অগ্নি পাথার | কল্‌রোল্-কল | কোলাহল্ ০ ০

( যান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—নজরুল ইসলাম )

ব্রাহ্মণ যুবা | যবনে মিলেছে | পবন্ মিলেছে | বহ্নি সাথে ০
এ কোন্ বিধাতা | বজ্র ধরেছে | নব সৃষ্টির্ | প্রলয় রাতে ০

( যান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—মোহিতলাল)

পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ একী | সন্ন্যাসী ০
বিশ্বময় | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে ০ ০
ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিশ্বাসি ০
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে ০ ০

( পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ )

(আজ) সংকেত | শংকিতা | বন বীথি | কায়
(কত) কুলবধূ | ছিঁড়ে শাড়ি | কুলের কা | টায়

( চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—নজরুল ইসলাম )

পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি | নির্বাক্ বিস্ময়্ ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু | পুষ্প শরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে | পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। | নিরস্ত্র মদন্ পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত | প্রসন্ন বয়ানে ॥

( অক্ষরবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ )

রাজশক্তি | বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারক্ত রাগ্ সম | তন্দ্রাতলে হয়্ হোক্ লীন্,
কেবল্ একটি দীর্ঘশ্বাস।
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে | সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।

( প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ )

গুরু উদ্ধৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'বক্ষে', 'অগ্নেয়াদ্রি', 'অগ্নি', 'ব্রাহ্মণ', 'বহ্নি',

'বজ্র', 'সৃষ্টির', 'পঞ্চ', 'দগ্ধ', 'সন্ন্যাসী', 'বিশ্বময়', 'নিশ্বাসি', 'অশ্রু' প্রভৃতি শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং 'কালানল্', 'কোলাহল্', 'পবন্' 'প্রলয়', 'তার' 'সংকেত' 'শংকিতা' 'বীথিকায়', 'কুলের' প্রভৃতি হলন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর ছন্দের হিসেবে দু'মাত্রার এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'পরক্ষণে'র 'ক্ষ' ধ্বনির পূর্বস্বর, 'বিস্ময়'র 'স্ম'য়ের 'পুষ্প'র 'প্প'র 'সমর্পিল' এর 'র্প'র, 'পদপ্রান্তের' 'প্র'র, 'শূন্য'র 'ন্য'র, 'নিরস্ত্রর' 'স্ত্রর, 'শক্তির' 'ক্তর' 'বজ্র' এর 'জ্র'র, 'নিত্য'র 'ত্য'র, 'উচ্ছ্বসিত' এর 'চ্ছ্ব' প্রভৃতির ধ্বনির পূর্বস্বর ছন্দের হিসাবে একমাত্রার হলেও যথারীতি আবৃত্তির সময়ে কান সজাগ ক'রে রাখলে দেখা যাবে এ সব ধ্বনির পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য দুই কিংবা এক মাত্রার যেমনিই হোক না কেন এ দৈর্ঘ্য যতটা না স্বরভিত্তিক তার চেয়েও বেশী ক'রে এ সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম ধ্বনি কিংবা হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ভিত্তিক। এ সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে উচ্চারকেরা কিছুক্ষণের জন্য আঁটকে গিয়ে তাদের ওপরে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যর আরোপ করে। এ ধরণের ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারকদের আঁটকে দিয়ে যথাযথ উচ্চারণ করতে পারলে তাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনির ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্যের স্বাদ পাওয়া যায়। এ ভাবে ধ্বনির পূর্বাপর ঝঙ্কারে কবিতায় 'ধ্বনিরাত্মা সর্বস্ব' অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট কবিতা-সৃষ্টিতে যদিও বা ধ্বনিই একমাত্র উপকরণ নয় তবু ধ্বনির উদাত্ত গম্ভীর ও মনোহর ব্যঞ্জনাগুণই এ ভাবে পাঠক ও শ্রোতার চিত্তে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস' এর উদ্রেক করে। এ জন্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি বা 'নাদকে' ব্রহ্মনামে অভিহিত করেছেন এবং ধ্বনিগুণের এ রসানন্দকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

দৈর্ঘ্যের মতো stressও ধ্বনিকে গুণময় করে। ধ্বনির নানাগুণে বাকপ্রবাহ গুণান্বিত হয়। বাকপ্রবাহের অন্যান্যগুণ থেকে ধ্বনিসংশ্লিষ্ট শ্বাসক্ষেপনের জোরটুকুকে কোন ক্রমে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে যা পাওয়া যায় তাকেই stress বা aceent নামে অভিহিত করা যায়। বাংলায় stress কে

ঝোঁক : stress

ঝোঁক, প্রস্বন, প্রচাপন, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করার বিবিধ প্রয়াস করা হয়েছে। ধ্বনি বা অক্ষরের (syllable) প্রচাপন গুণ যত না শ্রুতিগ্রাহ্য তার চেয়েও বেশী ক'রে বক্তার সক্রিয় প্রয়াসজাত (—a subjective activity of the speaker)। সেজন্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ কিংবা শব্দাক্ষর উচ্চারণ করার সময় তার পরিমাণ অনুযায়ী বক্তারও চোখমুখের ভঙ্গী বিকৃত হয় এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রবলভাবে আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট ধ্বনি, অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণে বক্তার শ্বাসক্ষেপনের বেগ বা চাপ এ জন্যে অনুভূতির তারতম্য অনুসারে লঘু গুরুরূপ লাভ করে।

ইংরেজীতে ˈincrease (ˈinkri:s,n), inˈcrease (inˈkri:s,v), ˈimport (ˈimpo:t,n), imˈport (imˈpo:t,v), ˈpresent (ˈpreznt,n) preˈsent (priˈzent, v) ˈinsult (ˈinsʌlt,n), inˈsult (inˈsʌlt,v) প্রভৃতি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যেখানে একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অর্থ হ'তে দেখি। ইংরেজী, জার্মান, স্পেনীয়, গ্রীক এবং সোয়াহিলী প্রভৃতি ভাষায় বিচ্ছিন্ন শব্দাবলীতে (words in isolation) এ ধরণের শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের সাহায্যে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং পৃথক পৃথক শব্দে শ্বাসাঘাতের বহুল প্রচলন থাকায় এগুলোকে 'stress language' বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ভাষা বলা হয়।

বাক্যে পার্শ্ববর্তী শব্দ কিংবা শব্দাবলীর তুলনায় কোনো শব্দের অর্থে আবেগের গভীরতা কিংবা কোন বৈপরীত্য (contrast) সৃষ্টির জন্যে সাধারণত শ্বাসাঘাতের ব্যবহার হয়। বাক্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে সেজন্যে শব্দের নির্ধারিত শ্বাসাঘাত কখনও লুপ্ত হয়, কখনও স্থান পরিবর্তন করে আর কখনও বা অক্ষুন্ন থাকে। ইংরেজীর মতো বাংলা Stress বা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা নয়। এমন কি বাংলায় একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থানপরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অর্থ উদ্রিক্ত করার অবকাশও নেই। সে জন্যে জাপানী, হিন্দুস্থানী মারাঠী প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলাকে Stressless language তথা শ্বাসাঘাতহীন ভাষা বলা হয়। শব্দের মধ্যে stressএর অবকাশ থাক বা না থাক শ্বাসাঘাতহীন ভাষাগুলোতে যে তাই ব'লে শ্বাসাঘাতের কোন

অবকাশ নেই, তা সত্য নয়। এ ধরণের ভাষায় শব্দের নিজস্ব শ্বাসাঘাত না থাকলেও বাক্যে জীবন্ত অনুভূতির দ্যোতক হিসেবে কোন না কোন শব্দের বিশেষ ধ্বনি কিংবা অক্ষরে নিশ্বাসের কোন না কোন প্রকারের আপেক্ষিক গুরুত্ব জানিত চাপ না প'ড়ে পারেনা। এ চাপটুকুই তাকে তার পার্শ্ববর্তী অন্য ধ্বনি ও শব্দাংশের তুলনায় বিশিষ্ট ও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক ক'রে তোলে। এ রকম পরিবেশেই বিশেষ কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হবার পূর্বে যেমন ছিল তার তুলনায় বাক্যের ভেতরে অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে এবং মূল অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ বাচক কিছু পরিস্ফুট না ক'রে তুললেও আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত কোন রূপকার্থ প্রকাশ করে কিংবা ব্যক্তিহৃদয়ের জীবন্ত স্পর্শ পেয়ে গভীরতা লাভ করে। তুলনীয় 'তুমি যাও' এ বাক্যটির সাধারণ উচ্চারণ। বক্তা স্বাভাবিক ভাবে এ কথাটি উচ্চারণ করলে শ্রোতার সহজ ভাবে চ'লে যাবার কথাই বোঝাবে কিন্তু বক্তা ক্রোধান্বিত অবস্থায় সেই মুহূর্তে শ্রোতার উপস্থিতি সেখানে অবাঞ্ছিত মনে ক'রে যদি উগ্রভাবে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা হ'লে তার কণ্ঠ স্বরের জোরের সঙ্গে সমস্ত শরীরের ভারও গিয়ে পড়বে 'যাও' শব্দটির প্রথম ধ্বনি 'যা' র ওপর। ফলে ধ্বনিটি শুধু যে প্রচাপিতই হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি 'আ'-ও পার্শ্ববর্তী স্বরধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রলম্বিত হ'য়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত 'যাও' এর তুলনায় এ 'যা—ও'কে বিশেষিত ক'রে তুলবে। এ ভাবে আগের ও পরের 'যাও' মূলত এক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও আবেগের তারতম্যজানিত এ দুরকম উচ্চারণে তারা দু'টি ভিন্ন শব্দ হয়ে উঠবে।

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উচ্চারণে শব্দের শ্বাসাঘাত দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বিশেষ ক'রে কলকাতার শ্যামবাজারী standard dialect ভাষীদের মুখে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রচলন আছে। এ শ্বাসাঘাত প্রবল না হলেও খুব যে দুর্বল তাও নয়। 'মাথা, 'হাত, 'মনোরঞ্জন এবং এ ধরণের অগনিত শব্দের উচ্চারণ খেয়াল করে শুনলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। বাংলা শব্দের আদ্যক্ষরের এ ঝোঁক যত না রীতির শাসনানুগ তারও চেয়ে বেশী কথা বলার সূচনাজনিত প্রয়াস বা impetusজাত। স্বতন্ত্র শব্দের এ ধরণের ঝোঁক বাক্যের মধ্যে লুপ্ত হ'তে

পারে কিংবা ভাবঅর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন শব্দেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শব্দের তুলনায় বেশী চাপ খেয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এ প্রশ্ন বোধক বাক্যটীর তিনটি শব্দের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করলে তাদের পরবর্তী অক্ষরগুলোর তুলনায় প্রথম অক্ষরে আপেক্ষিক শ্বাসাঘাত লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু এ বাক্যে স্বাভাবিক প্রশ্নবোধক উচ্চারণে প্রথম শব্দদুটির তুলনায় তৃতীয় শব্দ 'যাচ্ছ' এর 'যাচ' এর ওপরে ঝোঁকটা বেশী পড়ে।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হবে যে বাংলা ইংরেজীর মত stress language না হলেও অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক ইংরেজী শব্দের যে ধরণের stress ব্যবহৃত হয় বাংলা শব্দে সে রকম stress ব্যবহৃত না হলেও এবং একই ইংরেজী শব্দে stress এর স্থান বদল হলে শব্দগত দিক থেকে তার যেমন দু'টো অর্থ হয় ( তুং 'Present এবং Pre'sent ইত্যাদি ) বাংলাতে সে ধরণের stress না থাকলেও বাংলা একেবারে stress বর্জিত ভাষা নয়। জীবন্ত ভাষা হিসেবে কোন ভাষা সম্পূর্ণ stress বর্জিত হ'তে পারে কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। মানুষের মুখে ভাষা কথা হ'য়ে উঠ্‌লে, অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের হৃদয়ের জারক রসে ভাষা রঞ্জিত হতে গেলেই তা নিছক একটানা স্রোতময় হ'য়ে বেরুতে পারেনা—তার উত্থান পতন থাকবেই। এ উত্থানপতনই ধ্বনির তরঙ্গমালা। এ তরঙ্গ আবেগের দোলায়, প্রেম প্রীতির অনুভূতিতে, ক্রোধ ও হিংসা দ্বেষের গ্লানিতে নানাভাবে উঁচুনীচু গতিময় হ'য়ে ওঠে। মুখনিঃসৃত কথার প্রকাশভঙ্গীর সেই পার্থক্য ভাষার শব্দাবলীর কোনটাকে জোরের সঙ্গে, কোনটাকে ধীরমন্থর গতিতে কোনটাকে দীর্ঘায়িত ক'রে আর কোনটাকে ঝটিতে বের ক'রে দেয়। তাতেই শব্দাবলীতে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থও অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে। মানুষের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোন শব্দ এ কারণে শ্রুতিব্যঞ্জনার দিক থেকে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে।

শব্দ ও শব্দের অক্ষর বিশেষের এ প্রাধান্য সংঘটিত হয় ভাষাবিশেষে নিছক stressএর সাহায্যে কিংবা lengthএর সাহায্যে, আবার ভাষাবিশেষে stress ও length উভয়ের সাহায্যেই। বাংলাভাষায় আবেগের প্রকম্পনজনিত ভাবানুভূতির প্রাধান্য ও তারতম্য কিংবা শব্দার্থের বৈপরীত্য সৃষ্টি

হয় নিছক stress বা ঝোঁকের সাহায্যে ততটা নয় যতটা উভয়ের মিলিত দ্যোতনায়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা 'অদ্ভুত' কিংবা 'প্রকাণ্ড' এর যে কোন একটি শব্দের বিশ্লেষণই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে। কমপক্ষে দুজন মানুষ নাহলে কথার মাধ্যমে সমাজ জীবনের কোন পরিবেশই সৃষ্টি করা যায় না। তাতে একজন কথা বলে আর একজন শোনে। এ ধরণের পরিবেশবিশেষে বক্তা যদি শ্রোতাকে লক্ষ্য ক'রে তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে 'প্রকাণ্ড' শব্দটি উচ্চারণ করে তাহ'লে তার অর্থ একটা statement বা বর্ণনার মতো শোনাবে কিন্তু 'প্রকাণ্ড' শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর (syllable) 'কা' শুরু হ'তে না হ'তে তার ওপরে যদি তার নিশ্বাসের কিছু বেশী চাপ পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে 'ক' এর সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির 'আ' যদি 'প্রকা---ণ্ড'! ভাবে তার অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসেবে যথারীতি প্রলম্বিত হ'য়ে যায় তা হলে সেখানে কি আমরা বক্তার অনুভূতি লব্ধ বিস্ময়বোধের সঙ্গে পরিচিত হবোনা? দুবারে দুধরণের উচ্চারণে 'প্রকাণ্ড' শব্দটির মূলধ্বনি কয়টির (প্-র্-অ-ক্-আ-ণ্-ড্-অ) পরিবর্তন হয়নি অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের দ্বিতীয় সিলেবলের উচ্চারণের তারতম্য অর্থাৎ প্রথম বারে সেখানে stress এবং length বর্জিত উচ্চারণ এবং দ্বিতীয় বারের ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যসমন্বিত উচ্চারণ শব্দটিতে দুটি অর্থের আরোপ করেছে। 'বালা' (bālā) এবং 'মালা' (mālā) শব্দ দুটিতে তিনটি ধ্বনি ā, l এবং ā একই অথচ প্রথমধ্বনি দুটি 'ব' (b) এবং 'ম' (m) ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে আমরা স্বতন্ত্র অর্থবোধক দুটি শব্দ পাচ্ছি। এ কারণেই 'ব' এবং 'ম' দুটো মূলধ্বনি বা স্বতন্ত্র phoneme!

Secondary Phoneme : অতিরিক্ত ধ্বনিমূল

'প্রকাণ্ড' শব্দটির এ ক্ষেত্রে দুই রকম উচ্চারণে দ্বিতীয়বারের ঝোঁক ও দৈর্ঘ্য তার ওপরে স্বতন্ত্র অর্থের আরোপ করায় এ ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যও এখানে একরকম 'phoneme' এর কাজ করছে। বাংলাতে এ কারণে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দার্থের বিশ্লেষণে stress কিংবা length পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে Secondary phoneme তথা অতিরিক্ত 'ধ্বনিমূল' হিসেবে গ্রহণযোগ্য। 'Every word used in a new context is a new word' এ কালের ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা এ কথা যে জোরের সঙ্গে বলেন তার যাথার্থ্য তাঁরা খুঁজে পান stress, length, emphasis

প্রভৃতি ধ্বনিগুণের সাহায্যে। বাংলা বাগধ্বনি প্রবাহের শব্দার্থের বিশ্লেষণে এবং তার সৌন্দর্য উদঘাটনে ধ্বনির attributes বা গুণগত দিক থেকে stress, length, emphasis ও intonation এরও আমাদের ভাষায় তাই আশ্চর্য স্বীকৃতি দেখতে পাই।

এখানেই intonation* বা ধ্বনিতরঙ্গের কথা আসে। বাংলায় ধ্বনি তরঙ্গের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত কলমুখরিত নদীস্রোতের সঙ্গে ভাষার ধ্বনি তরঙ্গের তুলনা ক'রে এ আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। নদীতে কোন আলোড়নের সৃষ্টি না হ'লে নদীর পানি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমতল ভূমির মতো যেমন সটান ঘুমিয়ে থাকে, মানুষের মুখে কথা হ'য়ে ফুটে না উঠলে ভাষা আছে কি নেই তেমনি তার অস্তিত্বও উপলব্ধি করা যায় না। কোন কারণে একটু আলোড়িত হ'লে নদীর পানিতে যেমন অগণিত ছোট বড়ো স্পন্দনের সৃষ্টি হয় তেমনি মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই হোক কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশের বাহক হিসেবেই হোক মানুষের মুখনিঃসৃত হ'তে গেলেই ভাষা নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনা। তাতে দোলা লাগে। একটানা নিশ্বাসের সাহায্যে শব্দগুলো লেখ্যপংক্তির মতো কিংবা বলাকার শ্রেণীর মতো লম্বমান রেখা টেনে এগিয়ে যায় না। নিশ্বাসের ভাঙাচোরায়, ভাবের ওঠানামায় শব্দগুলোও তরঙ্গিত হ'য়ে এগিয়ে চলে। বাক প্রবাহের এ স্পন্দনই ভাষার প্রাণ, তার জীবন্ত ( anima-voce )রূপ। সে জন্যে ভাষা জীবন্ত মানুষেরই। মৃত মানুষের কোন ভাষা নেই। তাই জীবন্ত মানুষের ভাষায় নিশ্বাসের কিংবা ভাবাবেগের নিয়মিত ওঠানামাজনিত সমমাপের ব্যবধান তথা rhythm বা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। সমমাপের তরঙ্গায়িত এ ব্যবধান অন্যকথায় rhythm বা ছন্দস্পন্দই বাকস্রোতকে প্রাণবন্ত ক'রে ধ্বনিতরঙ্গ বা intonation এর সৃষ্টি করে।

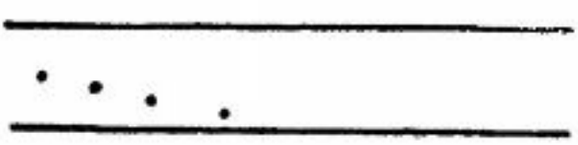
Intonation
ধ্বনিতরঙ্গ

যে কোন একটি বাক্যে কোন একটি শব্দ বা অক্ষর বিশেষের ওপরে

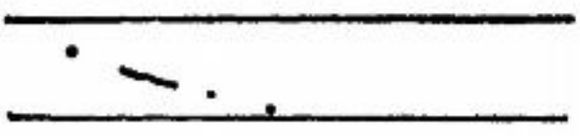
---

* "Intonation is the term given to the rise and fall in the pitch of the voice in speech. Change in pitch is due to differing rates of vibration of the vocal cords." The Phonetics of English Ida Ward 1944. p 169

তার পার্শ্ববর্তী শব্দ বা অক্ষরের তুলনায় আপেক্ষিক জোর ( emphasis, weight ), ঝোঁক, কিংবা দৈর্ঘ্যের আরোপ সেই বাক্যে নানা ধরণের ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 'ও খেয়েছে' এই একটি ছোট বাক্যই বিশ্লেষণ করা যাক :—

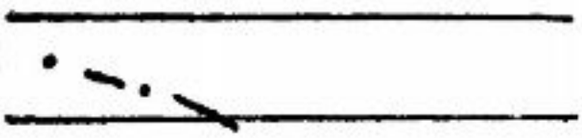
(১) ও খেয়েচে। 

এ বাক্যের দু'টো শব্দে চারটি অক্ষর ( syllable ) আছে। মাঝামাঝি স্বরগ্রামে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটি আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি সিলেবলকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে যদি নামিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তা'হলে 'ও খেয়েছে' ( ওর খাওয়া হয়েছে ) এ সংবাদ পরিবেশন ছাড়া এতে আর কিছু পরিস্ফুট হবেনা।

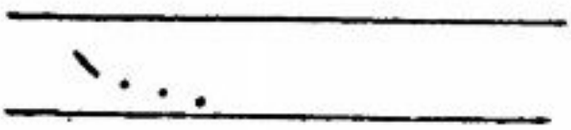
(২) ও 'খে—য়েচে। 

এবারের উচ্চারণে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরে চাপদিয়ে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত ক'রে শেষের অক্ষর দুটিকে হাল্কাভাবে ছেড়ে দিলে তাতে যে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হবে তার ফলে বক্তার বর্ণিত ব্যক্তির খাওয়া যে সুনিশ্চিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবেনা। ( তার শ্রোতার মনে আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ছিল )

(৩) আর শ্রোতাটির মনে কোন সন্দেহ থাকলে কিংবা তার খাওয়া তার বিশেষভাবে কাম্য হলে এবং এ বিষয়ে বক্তাকে বারবার প্রশ্ন করলে বক্তা তার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে বারবার বলার জন্য নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে এ বাক্যটির যে উচ্চারণ করবে তাতে

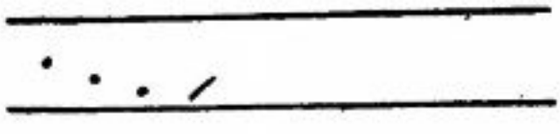
ও 'খেয়েচে—। 

এ রূপ নেবে। এতে দ্বিতীয় অক্ষরটি দ্রুত ঝোঁকের সঙ্গে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যযুক্ত হবে, তৃতীয় অক্ষর সঙ্কুচিত হবে আর শেষ অক্ষর 'চে' হবে প্রলম্বিত।

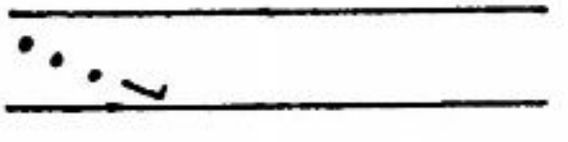
(৪) ও খেয়েচে। 

এ বাক্যের এ ধরণের উচ্চারণে প্রথম অক্ষরে বক্তার ফুস্‌ফুস্ নিঃসৃত বাতাসের চাপ এবং তার সামান্য প্রলম্বন আর দ্বিতীয় শব্দের অক্ষর তিনটির আপেক্ষিক নিম্নগামিতা এমন একটি ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে যাতে শ্রোতার 'ওনয় বরং অন্য কেউ খেয়েছে'—এ বিশ্বাস ও সন্দেহের হয়েছে সম্যক নিরসন। আলোচ্য ব্যক্তিটির প্রতি শ্রোতার বিশ্বাস ভাঙতে এবং তার মনের সন্দেহ নিরসন করতে বক্তাকে 'ও' অক্ষরটির ওপরে তার কিছু নিঃশ্বাসজনিত প্রাণশক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে।

তার শ্রোতার এ ধরণের উক্তিতেও যদি সন্দেহের নিরসন না হয় তাহ'লে ক্রমেই বক্তার ক্রোধের মাত্রা বাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে 'ও'র ওপরে তার ঝোঁকের আর তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের মাত্রা বাড়তে থাকবে। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এ ধরণের কথা কাটাকাটির অবতারণা অন্যান্য দর্শক ও শ্রোতার জন্যে বিশেষ উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। এ উক্তির সত্যতা পাঠকেরা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন।

(৫) ও খেয়েচে ? 

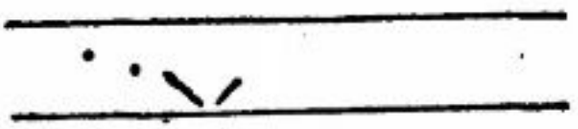
প্রশ্নবোধক এ উক্তিটিতে বক্তাই এবারে ওদের আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়া না খাওয়া সম্পর্কে হয়েছে সন্দিহান। তার শ্রোতার কাছ থেকে এবারে সে জবাব চায়—হয় হাঁ বোধক কিংবা না বোধক। এবারে বাক্যটির দ্বিতীয় অক্ষরে সামান্য ঝোঁক, তৃতীয় অক্ষরের সঙ্কোচন আর চতুর্থ অক্ষরের শেষে এবং ওপরের দিকে উত্থান—সবমিলে এমনই এক ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে যা ওপরে বর্ণিত চারটি থেকে একে স্বতন্ত্র ক'রে দিয়েছে।

(৬) ও খেয়েচে ! 

এবারের উচ্চারণে এতে যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রকাশ পাচ্ছে বক্তার বিস্ময়। প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হয়ে পরের

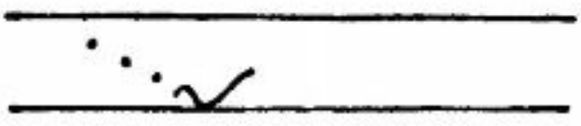
তিনটিতে ক্রমেই নীচে নেমে গেছে। আর চতুর্থ অক্ষরটি হঠাৎ নেমে গিয়ে শেষ হবার পূর্বমুহূর্তে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীকে ওপরে ওঠাবার জন্য যেন ধাক্কা দিয়ে গেছে। ধ্বনিতরঙ্গের এ রূপটি বক্তার মনে শুধুই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, কোন দুঃখ বা ক্রোধ নয়।

(৭) ও খে'য়েচে !!

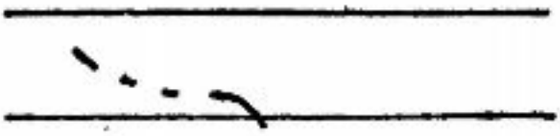


এ ভাবের উচ্চারণে অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষরটিতে নিশ্বাসের দ্রুত চাপদিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শেষ অক্ষরকে শুরু ক'রে ওপরের দিকে তার গতিকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর করলে বিস্ময়ের সঙ্গে বক্তার ক্রোধও প্রকটিত হবে। ও যদি সত্যি সত্যি খেয়েই থাকে তবে বক্তা যেন এবারে তাকে দেখে নেবার প্রতিজ্ঞা করছে।

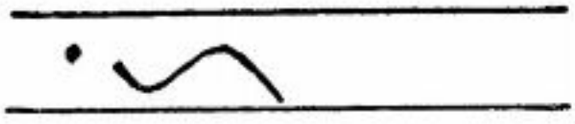
(৮) ও 'খেয়েচে



এ উক্তিতে অপূর্ব এক ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। স্বরতরঙ্গ এখানে প্রথম অক্ষরটির মাঝামাঝি স্বরগ্রামে সৃষ্টি হয়ে দ্রুত নেমে আসতে লেগে শেষ অক্ষরে যেখানে শেষ হচ্ছিল সেখানে ঝটিতে খাঁজে নেমে গিয়ে তাকে শেষ না হ'তে দিয়ে রীতিমতো ওপরের দিকে টেনে তুলেছে। ধ্বনি প্রবাহের এ ছন্দস্পন্দে বক্তা যেন তার শ্রোতার কাছ থেকে আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়ার সংবাদে তার আগ্রহের অবসান হওয়ায় বিশেষ ভাবে আনন্দিত হয়েছে। বাক্যটির এ ধ্বনিতরঙ্গে এমন একটি পরিবেশের কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে রুগ্ন ও মরণাপন্ন ছেলে কি মেয়ের পরিচর্যারত মা ও বাবাকে দেখা যাচ্ছে। রোগী খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ডাক্তার বলে গেছেন যদি কোন একটি পথ্য রোগী খেতে পারে তা হ'লে এ যাত্রা সে রক্ষা পাবে। মা রোগীর শিয়রে দণ্ডায়মান। বাবা কোথাও গিয়েছিলেন অন্য কোন তদ্বিরে। ফিরতে একটু দেরী হয়েছে। ফিরতে না ফিরতে সন্তান সেবারতা স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁদের সন্তানের পথ্যটুকু খাওয়ার সংবাদ তিনি পেলেন। এ সংবাদে মা বাবা উভয়ের চেহারায় আশার আলো দেখা যাবে না কি ?

(৯) 'ও খে—য়ে—চে 

এ ভাবে প্রথম অক্ষরে একটু ঝোঁক দিয়ে পরবর্তী অক্ষরগুলিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে শেষটিতে সামান্য একটু তরঙ্গ তুলে তাকে নামিয়ে দিলে যে ধ্বনি প্রবাহের সৃষ্টি হবে সেটাতে বক্তার আবদারের ও অভিযোগের সুর শোনা যাবে। এ রকম একটা পরিবেশের কথা স্মরণ করা যাক যেখানে দুভাই কিংবা দুবোন (দুবোনের উদাহরণই অধিকতর প্রযোজ্য) একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছিল। মা দুটো সন্দেশ রেখেছিলেন দুজনের জন্যে। স্কুলে যাবার সময় তাদের বলে দিয়েছিলেন ফিরে এসে দুজনেই যেন খায়। তাদের মধ্যে একজন কিছু আগে এসে দুটো সন্দেশই খেয়ে ফেলে। আর একজন কিছু পরে ফিরে এসে সন্দেশ খেতে গিয়ে দেখে যদি একটুও তার থাকত! মাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন 'তোমার ছোট বোনটি আগে এসে খেয়ে ফেলেছে।' এ সংবাদে বড় বোনের রাগ হওয়ায় কথা ছিল। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি তার প্রসন্ন দৃষ্টি ও স্নেহের প্রকাশ মার প্রতি এ ধ্বনিতরঙ্গে এমনি ভাবে ভেঙে পড়েছে—"ও খে—য়ে—চে।' 'তাতো হ'বেই ওতো তোমার সুয়ো মেয়ে ওকেতো প্রশ্রয় দেবেই,—তা ভালো, কি আর করা!'

(১০) ও খে 'য়ে—চে 

এখানে প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হ'য়ে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি অক্ষরের প্রথমটিতে দ্রুত নেমে গিয়ে দ্বিতীয় অক্ষরে আবার প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর যে স্বরগ্রামে শুরু হয়েছিল সেখানে উঠে গিয়ে তৃতীয় অক্ষরে নীচের দিকে ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হয়ে গিয়েছে। ফলে এমন এক ছন্দস্পন্দময় ধ্বনিতরঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে যাতে শ্রোতার ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে বক্তার মুখ ভেঙ্‌চে শ্রোতা যেন জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'ও কিছুতে খায়নি, সে নিজে খেয়ে 'ও'র ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়।

উদাহরণ আর বাড়ানোর প্রয়োজন করেনা। এ বাক্যটির ধ্বনিতরঙ্গের আরও রকমফের করলে আরও নানা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রত্যেক বারই ছোট্ট এ বাক্যটুকু থেকে স্বতন্ত্র অর্থ নির্গত হ'তে পারে।

জীবন্ত মানুষের মুখের ভাষার ধ্বনি তরঙ্গ এ কারণেই ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যের মতো অতিরিক্ত ধ্বনিমূল (Secondory phoneme) এর পর্যায়ভুক্ত। বাংলাভাষায় intonation বা ধ্বনিতরঙ্গের ব্যবহারিক রূপ থেকে এ সত্যের সমর্থন পাই।

pitchও ধ্বনিগুণের পর্যায়ভুক্ত। কথার 'tone' বা স্বরগ্রামের অবস্থানের অন্য নাম pitch, সংস্কৃতে উদাত্ত (high) অনুদাত্ত (low) এবং স্বরিত (mid) স্বরগ্রামের ব্যবহার রয়েছে। কথা শুরু করা কিংবা কোন লেখ্য বিষয় পাঠ করার সময় স্বরগ্রামের কোন্ পর্যায়ে কোন শব্দ বা অক্ষর আরম্ভ করা হচ্ছে—উঁচুপিচ্ বা 'high tone' এ, নীচুপিচ্ বা 'low tone' না মধ্যপিচ বা 'level tone' এ—গানের মীড়ের মতো কণ্ঠ স্বরের ওঠানামা জনিত অবস্থানের সেই মাপই 'pitch'। এ মাপ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে যে বিশেষভাবে সহায়তা করে ওপরের আলোচনা থেকে আশাকরি তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

Pitch : মীড়

বাঙালীর মুখনিঃসৃত ভাষা কাব্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে তাতে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত, শ্রুতিব্যঞ্জকতা, অর্থের প্রাধান্য, স্বরগ্রামের অবস্থিতি, ছন্দস্পন্দ প্রভৃতি গুণের অতিরিক্ত শব্দঝঙ্কারজনিত আরও কতকগুলো ধ্বনিগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গুলোও ধ্বনিকে নানাভাবে স্পন্দিত ক'রে সুদূর সঞ্চারী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। ধ্বনিগুণের সামগ্রিক মাধুর্য ব্যাখ্যায় কোন্ উপাদান বিশেষভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ধ্বনি তাত্ত্বিকদের পক্ষেও কম শক্ত নয়। বাক্প্রবাহে কোথায় কোন্ গুণ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ধ্বনি তাত্ত্বিক তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন কিন্তু গুণে গুণে মিলিত হ'য়ে ভাষায় যে নিরুপম ব্যঞ্জনা-ঝঙ্কার, ও রসমাধুর্যের সৃষ্টি হয় তা কোন একটি বিশেষগুণজাত নয়। সেখানে stress, quantity (length-shortness),: duration, prominence, pitch, rhythm ও intonation প্রভৃতি যাবতীয় গুণই—"all playing together like a chime of bells—are concordant and not quarrelsome elements in the harmony" sweetness and attributes of a langnage. এমন হ'লে মানুষের মুখের কথা এবং কবিতার ভাষা একাকার হ'য়ে যায়। বাংলাভাষার ধ্বনি মাধুর্যের আবিষ্কারের ব্যাপারেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।